২৭তম বিশ্ব যুবদিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর বাণী
"তোমরা প্রভুর সান্নিধ্যে সর্বদা আনন্দেই থাক" (ফিলিপ্পীয় ৪ঃ৪)

সুপ্রিয় যুব বন্ধুগণ,
২৭তম বিশ্ব যুবদিবসকে উপলক্ষ্য ক'রে আরও একবার তোমাদের উদ্দেশে কিছু বলতে পেরে আমি আনন্দিত। গত বছরের আগষ্ট মাসে মাদ্রিদে আমাদের মিলন মেলার স্মৃতি আমার অন্তরে জীবন্ত হয়ে আছে। এটি ছিল বিশেষ অনুগ্রহের সময়, যখন ঈশ্বর সারা পৃথিবী থেকে জড়ো হওয়া যুবক-যুবতীদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছিলেন। বিশ্ব যুবদিবস যে সব শুভ ফল বয়ে এনেছিল, সে সমস্তের জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; নিশ্চিতভাবেই সে সব শুভ ফল ভবিষ্যতে যুব-যুবতীদের জীবনে এবং তাদের নিজেদের সমাজ ও সম্প্রদায়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এখন আমরা তাকিয়ে আছি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে রিও দে জেনেইর-তে অনুষ্ঠিতব্য আমাদের পরবর্তী সম্মিলনের দিকে, যেটির মূলসুর হচ্ছেঃ "তোমরা যাও, আর সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর" (দ্রষ্টব্য: মথি ২৮ঃ১৯)।

এ বছরের বিশ্ব যুবদিবসের মূলসুর নেয়া হয়েছে ফিলিপ্পীয়দের কাছে লেখা সাধু পৌলের উদ্দীপনামূলক পত্র থেকেঃ "তোমরা প্রভুর সান্নিধ্যে সর্বদা আনন্দেই থাক" (ফিলিপ্পীয় ৪ঃ৪)। খ্রিস্টীয় জীবন-অভিজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে আনন্দ। প্রতিটি বিশ্ব যুবদিবসে আমরা অপরিসীম আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করিঃ এ হচ্ছে মিলনের আনন্দ, খ্রিস্টবিশ্বাসী হওয়ার আনন্দ, এ আনন্দ আমাদের বিশ্বাসের আনন্দ। এই আনন্দ প্রতিটি বিশ্ব যুবদিবসের অন্যতম দৃশ্যমান বিষয়। এ সম্মেলনগুলির প্রতি গভীর আকর্ষণ আনন্দ-উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তায় জর্জরিত এই জগতে আনন্দ হচ্ছে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সৌন্দর্য্য ও নির্ভরশীলতার বাস্তব সাক্ষ্য।

মণ্ডলীর আহ্বানই হচ্ছে জগতে শান্তি আনয়ন করা– যে শান্তি হবে প্রকৃত শান্তি, যে শান্তি হবে স্থায়ী শান্তি; স্বর্গদূতেরা রাখালদের কাছে এই শান্তির কথাই তো ঘোষণা করেছিলেন যীশুর জন্ম-রজনীতে (দ্রষ্টব্য: লূক ২ঃ১০)। ঈশ্বর কেবলমাত্র কথা ব'লেই থেমে থাকেননি, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বর কেবলমাত্র মহা নিদর্শন দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি আমাদের এত কাছে আসলেন যে, তিনি আমাদেরই একজন হয়ে উঠলেন, পরিপূর্ণভাবে তিনি মানব-জীবন যাপন করলেন। এই কঠিন সময়ে তোমাদের চারপাশের শত-সহস্র যুবক-যুবতীকে শুনতে হবে যে খ্রিস্টীয় বারতা হচ্ছে আনন্দ ও প্রত্যাশার বারতা! তোমাদের সঙ্গে আমি এই আনন্দের বিষয়ে অনুধ্যান করতে চাই, অনুধ্যান করতে চাই কিভাবে এই আনন্দকে পাওয়া যায়– যাতে ক'রে তোমরা আরও গভীরভাবে এই আনন্দের অভিজ্ঞতা পেতে পার, যাতে ক'রে তোমরা এই আনন্দ বয়ে নিয়ে যেতে পার তোমাদের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেকজন যুবার কাছে।

১. আনন্দের জন্যই আমাদের হৃদয়কে গড়ে তোলা হয়েছেঃ

প্রতিটি মানব-মানবীর অন্তরে আনন্দের আকাঙ্খা উঁকি দেয়। তাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী সন্তুষ্টির অনুভূতির চেয়ে আমাদের অন্তর বরং যথার্থ, পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী আনন্দের অন্বেষণ করে, যে আনন্দ আমাদের বেঁচে থাকাকে বর্ণময় ক'রে তোলে। আর এ কথাটি যুবদের জন্য বিশেষভাবে সত্য, কারণ যুব বয়সটি হচ্ছে জীবনকে নিরন্তর আবিষ্কার করার সময়; এ বয়সটি হচ্ছে জগৎকে, অন্যদেরকে এবং নিজেদেরকেও আবিষ্কারের সময়। এ সময়টি হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে উন্মুক্ত দৃষ্টিতে তাকানোর সময়; এ সময়টি হচ্ছে সুখ, বন্ধুত্ব, সহভাগিতা ও সত্যকে গভীরভাবে আকাঙ্খা করার সময়। এ সময়টিতেই আমরা সু-আদর্শ দ্বারা আলোকিত হই এবং জীবনের জন্য মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনই ঈশ্বর-প্রদত্ত অসংখ্য সহজ-সরল আনন্দে ভরপুর হয়ে আছেঃ বেঁচে থাকার আনন্দ, প্রকৃতির সৌনন্দ উপভোগ করার আনন্দ, কোন কাজ সুসম্পন্ন করার আনন্দ, অন্যদেরকে সাহায্য করার আনন্দ আর আন্তরিক ও খাঁটি ভালোবাসার আনন্দ। সচেতনভাবে তাকালেই আমরা দেখতে পাবো আনন্দ করার আরও কত কারণ রয়েছে। পারিবারিক জীবনে আনন্দঘন সময় আছে, আনন্দ আছে বন্ধুত্বময় সহভাগিতায়, আনন্দ আছে আমাদের সুপ্ত প্রভিতা আবিষ্কারে, আনন্দ আছে আমাদের সাফল্যে, আনন্দ আছে অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার মধ্যে, আমাদের নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্যে আনন্দ আছে, অন্যেরা যখন আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝে তখন আনন্দ আছে, আমরা আনন্দ পাই তখন, যখন আমাদের দ্বারা অন্যদের কোন উপকার হয়। নতুন কোন কিছু শেখায়ও শিহরণ আছে। ভ্রমন ও অন্যদের সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে নতুন ও ব্যাপক কিছুকে প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করি; এভাবেই আমরা আমাদের ভবিষ্যতের ছক তৈরীর সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করি। এখানে আমরা একটি বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম পাঠের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে পারি– কালোর্ত্তীণ শিল্পকর্ম দেখে, বিখ্যাত সংঙ্গীত শুনে বা পরিবেশন ক'রে অথবা একটি চলচ্চিত্র দেখার কথাও উল্লেখ করতে পারি। এ সবকিছুই আমাদের জন্য প্রকৃত আনন্দ বয়ে আনতে পারে।

তবে এটা ঠিক যে, প্রতিদিন আমরা অনেক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হই। অন্তর-গভীরে ভবিষ্যতের জন্য একটা শংকা থেকেই যায়। আমরা ভাবতে শুরু করিঃ যে পরিপূর্ণ ও স্থায়ী আনন্দের আকাঙ্খা আমরা করছি, তা কেবল কল্পনা-বিলাস নয় তো? তা জীবন-বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বাঁচা নয় তো? অনেক যুবক-যুবতীই নিজেদের জিজ্ঞেস করেঃ খাঁটি আনন্দ পাওয়া আসলেই কি সম্ভব? আনন্দ লাভের তৃষ্ণা মানুষকে বিভিন্ন পথে চালিত করতে পারে; এ সমস্ত পথের অনেকগুলো বিপজ্জনক না হ'লেও শেষ অবধি ভুল পথ হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়। কিভাবে আমরা তাৎক্ষণিক ও কল্পনা-বিলাসী ভালো লাগা বিষয়কে প্রকৃত আনন্দদানকারী বিষয় থেকে আলাদা করতে পারি? জীবনে প্রকৃত আনন্দ আমরা কিভাবে পেতে পারি, যে আনন্দ স্থায়ী, কঠিন সময়ে যে আনন্দ আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায় না?

২. ঈশ্বরই হচ্ছেন প্রকৃত আনন্দের উৎসঃ

প্রকৃত আনন্দ যেখান থেকেই আসুক না কেন, এ আনন্দের উৎস স্বয়ং ঈশ্বরঃ এটা হোক নিত্য-দিনের ছোট-খাটো আনন্দ, হোক এটা জীবনের বিশাল আনন্দ। তবে কখনো কখনো তাৎক্ষণিকভাবে আনন্দের এই উৎসকে উপলব্ধিতে যেন ঠিক আনা হয় না! ঈশ্বর হচ্ছেন চিরন্তন ভালোবাসার এক মিলন, তিনি নিজেই অফুরন্ত আনন্দ, যে আনন্দ নিজের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিস্তৃত হয় অন্যদেরকে আলিঙ্গন করাতে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং ঈশ্বর যাদের ভালোবাসেন। ঈশ্বর ভালোবাসার কারণেই তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন; তাঁর ভালোবাসার বৃষ্টি-ধারা আমাদের উপর বর্ষণ করতে এবং তাঁর উপস্থিতি ও কৃপায় আমাদেরকে পূর্ণ করতে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর নিজের ঐশরিক এবং চিরকালীন আনন্দের সহভাগী হই। তিনি নিজেই আমাদেরকে গভীরভাবে জীবনের অর্থ ও এর মূল্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। এই অর্থ ও মূল্য নিহিত আছে ঈশ্বররের জীবনে আমাদের জীবন সাদরে গ্রহণীয় হওয়ার মধ্যে, তাঁর ভালোবাসা আমাদের জীবনে সঞ্চারিত হওয়ার মধ্যে। অথচ কখনও কখনও অন্যদেরকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠে। ঈশ্বর কিন্তু শর্তহীনভাবে আমাদেরকে গ্রহণ করেন; এতেই ভরসা পেয়ে আমরা বলতে পারিঃ "আমি ভালোবাসা পেয়েছি; এই পৃথিবীতে এবং ইতিহাসে আমার একটা স্থান আছে; ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ভালোবাসেন। আমি যদি নিশ্চিতভাবেই জানি যে ঈশ্বর আমাকে গ্রহণ করেন ও ভালোবাসেন, তাহ'লে আমি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে এ-ও জানি যে, আমার এই বেঁচে থাকাও সত্যিই মঙ্গলময়।"

আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা যীশু খ্রিস্টের জীবনে দৃশ্যমান হয়। যে আনন্দের অন্বেষণ আমরা করছি, তা তাঁর কাছেই পাওয়া যায়। মঙ্গলসমাচারের ঘটনাবলীতে আমরা দেখি, যীশুর জীবনের শুরুটা কেমন আনন্দের! মহাদূত গাব্রিয়েল যখন কুমারী মারীয়াকে জানালেন যে তিনি মুক্তিদাতার মা হবেন, তখন তাঁর প্রথম কথাই ছিলঃ "আনন্দ কর" (লূক ১ঃ২৮)। যখন যীশুর জন্ম হয় তখন প্রভুর দূত রাখালদের বলেনঃ "আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদের নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন– তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু" (লূক ২ঃ১০-১১)। পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতগণ শিশুকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন এবং "তাঁর তারাটি উদিত হতে দেখে তারা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন" (মথি ২ঃ১০)। ঐশ সান্নিধ্যই হচ্ছে এই সব আনন্দের কারণঃ তিনি আমাদেরই একজন হয়ে উঠলেন। ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে সাধু পৌল এই কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন; তিনি লিখেছেনঃ "তোমরা সবাই প্রভুর সান্নিধ্যে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক! তোমরা যে কত সহিষ্ণু-বিবেচক মানুষ, সে কথা সকলেই জানুক। প্রভুর আসতে তো আর দেরী নেই" (ফিলিপ্পীয় ৪ঃ৪-৫)। প্রভুর সান্নিধ্যেই হচ্ছে আমাদের আনন্দের প্রথম কারণ; এই প্রভুই আমাকে স্বাগত জানান, আমাকে ভালোবাসেন।
যীশুর সাথে সাক্ষাতের প্রতিটি ঘটনায় অফুরন্ত আত্মিক আনন্দের উন্মেষ ঘটে। মঙ্গলসমাচারের অনেক ঘটনায় আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। আমরা স্মরণ করি অসৎ করগ্রাহক ও পাপী হিসেবে পরিচিত জাখেয়ের সাথে যীশুর সাক্ষাতের ঘটনাটি। যীশু তাকে বলেছিলেনঃ "আমাকে যে আজ তোমার বাড়ীতেই থাকতে হবে।" এরপর, সাধু লূক আমাদের বলেন যে, জাখেয় যীশুকে "আনন্দের সঙ্গেই বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাল" (লূক ১৯ঃ৫-৬)। এ আনন্দ হচ্ছে প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ। এ আনন্দ ঈশ্বরের ভালোবাসা অনুভবের আনন্দ, যে ভালোবাসা আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটাকেই পাল্টে ফেলতে পারে; এ ভালোবাসাই আমাদের জীবনে পরিত্রাণ আনে। জাখেয় তার জীবনটাকে পাল্টে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল; তার সম্পত্তির অর্ধেকটাই গরীবদের দান করার সিদ্ধান্তও সে গ্রহণ করল।

যীশুর যন্ত্রণাভোগের সময় এই ভালোবাসা এর সর্বময় শক্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই মর্তধামের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সান্ধ্যভোজে তাঁর বন্ধুদের যীশু বলেছিলেনঃ "পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থেকো....এসব কথা তোমাদের বললাম, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হ'তে পারে" (যোহন ১৫ঃ৯,১১)। পিতার সাথে যীশুর যে আনন্দের পূর্ণতার সহভাগী, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এবং আমাদের প্রত্যেককে সেই আনন্দের পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে চান, যেন তাঁর জন্য পিতার যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা যেন আমাদের মধ্যেও থাকতে পারে (দ্রষ্টব্যঃ যোহন ১৭ঃ২৬)। ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতি উন্মুক্ততা এবং তাঁর সাথে যুক্ত থাকার মধ্যেই উন্মেষ ঘটে খ্রিস্টীয় আনন্দের।

মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত ঘটনায় আমরা দেখি, যীশুর মৃত্যুর পর যেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল, মারীয়া ম্যাগ্ডালিন এবং কয়েকজন মহিলা সেই করব দেখতে গিয়েছিলেন। একজন স্বর্গদূত তাঁদের চমকিত ক'রে দিয়ে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ তাঁদের দিয়েছিলেন। এরপর, মঙ্গলসমাচার রচয়িতার বর্ণনা অনুযায়ী, তারা "ভয়–মেশানো আনন্দ" নিয়ে তাড়াতাড়ি সমাধিস্থান ছেড়ে চলে গেলেন যীশুর শিষ্যদের সঙ্গে এই আনন্দ-বার্তা সহভাগিতা করতে। পথিমধ্যে যীশু তাঁদের দেখা দিলেন এবং বললেনঃ "শান্ত হও" (মথি ২৮ঃ৮-৯)। এতে তাঁরা মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সেই খ্রিস্ট যিনি জীবিত আছেন, যিনি মন্দতা, পাপ ও মৃত্যুকে জয় করেছেন। পুনরুত্থিত হিসেবেই তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত; তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন জগতের অন্তিমকাল

পর্যন্ত (দ্রষ্টব্যঃ মথি ২৮ঃ২০)। আমাদের জীবনে মন্দতা চূড়ান্তভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে না, বরং পরিত্রাতা খ্রিস্টে বিশ্বাস আমাদেরকে বলে যে ঈশ্বরের ভালোবাসাই সর্বজয়ী।

গভীর আনন্দ হচ্ছে পবিত্র আত্মার ফল; এই পবিত্র আত্মাই আমাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান ক'রে তোলেন, তাঁর মহত্ব অভিজ্ঞতা ও আস্বাদন করতে এবং তাঁকে "আব্বা", পিতা ব'লে ডাকতে সমর্থ ক'রে তোলেন (দ্রষ্টব্যঃ রোমীয় ৮ঃ১৫)। আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটে আনন্দেরই মধ্য দিয়ে।

৩. আমাদের অন্তরে খ্রিস্টীয় আনন্দকে ধ'রে রাখাঃ

এ পর্যায়ে প্রশ্ন জাগেঃ "গভীর ও আধ্যাত্মিক আনন্দের এই উপহার আমরা কিভাবে পাই? কিভাবেই বা তা কাজে লাগাই?"

সামসংগীতের একটিতে লেখা আছেঃ "প্রভুই হোন একান্ত আনন্দ তোমার, তোমার মনের আশা তিনিই তো পূর্ণ করবেন" (সাম ৩৭ঃ৪)। যীশু আমাদেরকে বলেনঃ "স্বর্গরাজ্য যেন কোন জমিতে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনেরই মতো। একটি লোক তা খুঁজে পেয়ে সেখানেই আবার তা লুকিয়ে রাখল; তারপর মনের আনন্দে গিয়ে তার যা কিছু ছিল, সমস্তই বেচে দিয়ে সেই জমিটা কিনে ফেলল" (মথি ১৩ঃ৪৪)। আধ্যাত্মিক আনন্দের সন্ধান লাভ এবং সে আনন্দ জীবনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যীশুর সাথে সাক্ষাতেরই ফসল। আমাদেরকে যীশু আহ্বান জানান যেন আমরা তাঁকে অনুসরণ করি, যেন তাঁর সাথে নিজেদের শক্ত ক'রে বেঁধে রাখি। সুপ্রিয় যুবক-যুবতীগণ, যীশুর জন্য ও তাঁর মঙ্গলসমাচারের জন্য তোমাদের জীবনে জায়গা ক'রে নেবার ঝুঁকি নিতে ভয় পেও না তোমরা। এটিই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আসল সুখ পাওয়ার উপায়। ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও তাঁর প্রতিমূর্তিতে গড়া ঐশ-সন্তানের জীবন-যাপন করার এটিই উপায়।

প্রভুতেই আনন্দের অন্বেষণ করঃ কারণ আনন্দ হচ্ছে বিশ্বাসের ফল। আনন্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদিনই তাঁর উপস্থিতি এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠাঃ "প্রভুর আসতে তো আর দেরী নেই" (ফিলিপ্পীয় ৪ঃ৫)। ঈশ্বরে আমাদের আস্থা রাখা, তাঁর জ্ঞান ও ভালোবাসায় বৃদ্ধি পাওয়া– সে-ই তো আনন্দ! আর কিছুদিন পরেই আমরা "বিশ্বাসের বর্ষ" শুরু করব; এটি আমাদেরকে সাহায্য করবে, উৎসাহিত করবে। প্রিয় বন্ধুগণ, ঈশ্বর তোমাদের জীবনে কেমন ক'রে কাজ ক'রে চলেছেন, তা দেখতে শেখ; তোমার জীবনের নিত্য দিনের ঘটনায় অদৃশ্য ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে, তোমার দীক্ষাস্নানের দিনে তোমার সাথে যে সন্ধি তিনি করেছেন, সেই সন্ধির প্রতি তিনি সর্বদাই অটল। জেনে রাখ, ঈশ্বর কখনওই তোমাকে ছেড়ে যাবেন না। মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাও। তিনি তোমাকে ভালোবাসেন ব'লেই ক্রুশের উপর নিজের জীবন দিয়েছেন। মহান এই ভালোবাসার অনুধ্যানই আমাদের অন্তরে জাগায় একটি প্রত্যাশা, একটি আনন্দ। কোন কিছুই এই প্রত্যাশা ও আনন্দকে নষ্ট করতে পারে না। খ্রিস্টানদের কখনও বিমর্ষ হ'তে নেই, কারণ তারা খ্রিস্টের দেখা পেয়েছে– যে খ্রিস্ট তাদেরই জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন।

প্রভুর অন্বেষণ করা এবং আমাদের জীবনে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর বাণীকে গ্রহণ করা; এই বাণীই হচ্ছে আমাদের প্রাণের আনন্দ। প্রবক্তা জেরেমিয়া লিখেছেনঃ "যখনই আমার কাছে এসেছে তোমার কোন বাণী, আমি যেন তা গ্রাস ক'রেই নিয়েছি তখন। তোমার বাণী, তা ছিল আমার কাছে কত আনন্দের ধন, কত প্রাণের পুলকেরই ধন" (জেরে: ১৫ঃ১৬)। পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতে ও তা নিয়ে ধ্যান করতে শেখ। সেখানেই সত্য সম্পর্কে তোমার গভীর জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাবে। মানব জাতির ইতিহাসে ঈশ্বর যে অনন্য কাজ করেছেন,

ঐশবাণীতেই এর প্রকাশ ঘটে। এই ঐশবাণীই আমাদেরকে আনন্দে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে; এই বাণীই আমাদেরকে প্রশংসা ও আরাধনামুখী ক'রে তোলেঃ "ভগবানকে শোনাই, এসো, আনন্দের গান; আমাদের সৃষ্টিকর্তা ভগবান যিনি, এসো, তাঁর শ্রী চরণে নতজানু হই" (সামসংগীত ৯৫ঃ১,৬)।

উপসনা হচ্ছে সেই বিশেষ স্থান যেখানে মণ্ডলী প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া আনন্দের প্রকাশ ঘটান; এই আনন্দের সঞ্চারণ ঘটান এই জগতে। প্রত্যেক রবিবারের খ্রিস্টযাগে খ্রিস্ট-সমাজ পরিত্রাণ রহস্যের কেন্দ্রীয় রহস্যের উৎসব উদ্‌যাপন ক'রে থাকেঃ আর তা হচ্ছে খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান। প্রভুর প্রত্যেকজন অনুগামীর জন্য এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, কারণ তাঁর ভালোবাসাময় আত্মোৎসর্গ বাস্তব হয়ে উঠে। রবিবার হচ্ছে সেইদিন, যেদিন আমরা পুনরুত্থিত যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করি, তাঁর বাণী শুনি এবং তাঁর দেহ ও রক্তে পরিপুষ্ট হয়ে উঠি। সামসংগীতের একটিতে আমরা পাঠ করিঃ "এ দিনটি প্রভু নিজেই রচনা করেছেন; এসো আমরা উৎসব করি, আনন্দে মেতে উঠি" (সাম ১১৮ঃ২৪)। নিস্তার জাগরণীর রাত্রে ভক্তমণ্ডলী হর্ষধ্বনীসহ পাপ ও মৃত্যুর উপরে যীশু খ্রিস্টের বিজয়ের গান গেয়ে উঠেঃ "স্বর্গীয় দূতবাহিনী উল্লসিত হোক.....এই পবিত্র জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে পৃথিবী হর্ষোৎফুল্ল হোক....এই স্থান আলোর রশ্মিতে প্রদীপ্ত হয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক.... প্রভুর জনগণের জয়ধ্বনিতে অনুরণিত হয়ে উঠুক"। ঈশ্বরের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার বিষয়ে সচেতনা থেকেই আসে খ্রিস্টীয় আনন্দ; সেই ঈশ্বরই তো মানুষ হয়েছেন, আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন এবং মন্দতা ও মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়েছেন। আমাদের জন্য এই সব কিছুর মানেই হলো তাঁর জন্য ভালোবাসাময় একটি জীবন যাপন করা। একজন নবীন কার্মেলাইট হিসেবে শিশু যীশু ভক্ত তেরেজা লিখেছেনঃ "যীশু, তোমাকে ভালোবাসায়ই আমার আনন্দ" (নম্বর ৪৫, ২১ জানুয়ারী ১৮৯৭)।

৪. ভালোবাসার আনন্দঃ

সুপ্রিয় বন্ধুগণ, আনন্দ গভীরভাবে ভালোবাসার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হচ্ছে পবিত্র আত্মার অবিচ্ছেদ্য উপহার (তুলনীয়ঃ গালাতীয় ৫ঃ২৩)। ভালোবাসাতেই আনন্দের উন্মেষ ঘটে, আবার আনন্দ হচ্ছে ভালোবাসার একটি রূপ। কলকাতার ধন্যা তেরেজা যীশুর বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রেই বলেছেনঃ "পাওয়ার চেয়েই দেওয়াই বেশী আনন্দের" (শিষ্যচরিত ২০ঃ৩৫)। এর সঙ্গে যুক্ত ক'রে তিনি আরও বলেনঃ "আনন্দ হচ্ছে ভালোবাসার নির্যাস, যে আনন্দে মানবাত্মা আকৃষ্ট হয়; ঈশ্বর উদার-আনন্দিত দাতাকে ভালোবাসেন। আনন্দের সাথে যে দেয়, সে বেশীই দেয়।" ঈশ্বরের সেবক পোপ ৬ষ্ঠ পৌল লিখেছেনঃ "ঈশ্বর-প্রভুতে সবই আনন্দময়, কারণ তিনি কেবল দিয়েই যান" (প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র *Gaudete in Domino*, মে ৯, ১৯৭৫)। তোমাদের জানা উচিত, ভালোবাসা মানেই জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অঙ্গীকারের প্রতি অটল, বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া। এটি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য। আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে খাঁটি, নিষ্টাবান ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষ হিসেবেই দেখতে চায়; কারণ প্রকৃত ভালোবাসা কঠিন সময়েও অবিচল থাকে। একই কথা প্রযোজ্য তোমার কাজ, পড়াশোনা ও সেবা-কর্মের ক্ষেত্রেও। বিশ্বস্ত হ'লে এবং ভালো কাজে লেগে থাকলেই আনন্দ আসে; কখনও কখনও এই আনন্দ তাৎক্ষণিকভাবে আসে না।

ভালোবাসার আনন্দকে অভিজ্ঞতা করতে চাইলে আমাদেরকে উদার হ'তেই হবে। সামান্যতম দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর গেলা আমাদের কাজ নয়। জীবনে আমাদেরকে পূর্ণভাবেই আত্ম-নিবেদিত হ'তে হবে; যাদের জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন আছে, পূর্ণভাবেই তাদের প্রয়োজনের প্রতি আমাদের মনোযোগী হ'তে হবে। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য সেবাদানের আগ্রহী যোগ্য এবং উদার নর-নারীকে জগতের প্রয়োজন আছে। তোমাদের মেধার বিকাশের জন্য এবং সে মেধাকে এখন থেকেই অন্যদের মঙ্গলে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিটি বিবেক অনুসারী অধ্যবসায়ে যত্নবান হও। তোমরা যেখানে থাক না কেন, সমাজকে আরও ন্যায্য ও মানবীয় হওয়ার পথে সাহায্য করার উপায় বের কর। ক্ষমতা, বৈষয়িক ও আর্থিক সাফল্য লাভের লক্ষ্য দিয়ে নয়, বরং তোমাদের গোটা জীবনটা সেবা করার প্রেরণা দিয়েই চালিত হোক।

উদারতা বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি তোমাদেরকে বিশেষ এক আনন্দের কথা বলতে চাই। এই আনন্দ হচ্ছে প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের গোটা জীবনটাই তাঁকে নিবেদন করার আনন্দ। সুপ্রিয় যুবক-যুবতীগণ, খ্রিস্ট যদি তোমাদেরকে ব্রতীয় জীবনে, মঠবাসী জীবনে বা মিশনারী হ'তে অথবা যাজকীয় জীবনে তোমাদের আহ্বান জানান, তবে তাতে তোমরা ভয় পেও না। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, যারা তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্গ নেয় এবং পিছুটান ছাড়া অন্যদের সেবার পথে পা বাড়ায়, তিনি তাদের জীবনকে আনন্দে পূর্ণ ক'রে দেন। একইভাবে, বিবাহের মধ্য দিয়ে একটি পরিবার গঠন ক'রে যে সব নর-নারী পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করে এবং নিজেদের দাম্পত্য জীবনেই মণ্ডলীর জন্য খ্রিস্টের ভালোবাসার জীবন্ত চিহ্ন হয়ে উঠে, ঈশ্বর তাদের জীবনেও দান করেন অনাবিল আনন্দ।

আমি এখন তৃতীয় একটি বিষয় তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেটি তোমাদেরকে ভালোবাসার আনন্দের দিকে নিয়ে যাবে। আর এটি হচ্ছেঃ তোমাদের ব্যক্তি-জীবনে এবং তোমাদের সমাজ বা দলগত জীবনে ভ্রাতৃসুলভ ভালোবাসার বোধকে বাড়তে দেয়া। মিলন ও আনন্দের মধ্যে একটি গভীর বন্ধন আছে। "তোমরা প্রভুর সান্নিধ্যে সর্বদা আনন্দেই থাক" (ফিলিপ্পীয় ৪ঃ৪)– পৌলের প্রেরণা পত্রে এ কথাটি হুট ক'রে লেখা হয়নি, বরং 'তোমরা' শব্দে বহুবচন ব্যবহার ক'রে গোটা খ্রিস্টীয় সমাজকেই সম্বোধন করা হয়েছে, সমাজের সদস্যদেরকে এককভাবে নয়। শুধুমাত্র তখনই আমরা এই আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করি, যখন আমরা পারস্পরিক মিলনে একতাবদ্ধ থাকি। প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থে প্রথম খ্রিস্টীয় সমাজ সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছেঃ "তাদের ঘরে তারা রুটি ছেড়ার অনুষ্ঠান করত; তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত" (শিষ্যচরিত ২ঃ৪৬)। আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাই, খ্রিস্টীয় সমাজ যেন সহভাগিতা, অন্যদের প্রতি মনোনিবেশ এবং দরদ দেখানোর বিশেষ জায়গা হয়ে উঠে, তোমরা সে লক্ষ্যে সমস্ত চেষ্টাই ক'রে যাবে।

৫. মন পরিবর্তনের আনন্দঃ

প্রিয় বন্ধুরা, আনন্দ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রলোভনগুলোকে চিনতে পারাও কিন্তু প্রকৃত আনন্দ অভিজ্ঞতা করার অর্থ। আমাদের বর্তমান সময়ের কৃষ্টি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জন, তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি ও তাৎক্ষণিক সুখ লাভের জন্য আমাদের তাড়া করে। এটি দৃঢ় অধ্যবসায়ের চেয়ে দৃঢ় আনুগত্য, কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্পে স্থিরতাকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এর মর্ম থেকেই ভোগবাদী মনোভাব এবং মিথ্যা সুখের প্রতিশ্রুতির উদয় হয়। অভিজ্ঞতাই আমাদের শিক্ষা দেয় যে পেশা কখনো সুখের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কত মানুষই শত

বৈষয়িক সম্পদের মাঝে বসবাস করছে; অথচ তাদের জীবনে হতাশা, বিষাদ ও শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে আছে! স্থায়ী আনন্দ পেতে চাইলে আমাদের ভালোবাসা ও সত্যে জীবন-যাপন করা চাই। আমাদেরকে ঈশ্বরে জীবন-যাপন করতে হবে।

ঈশ্বর আমাদেরকে সুখী দেখতে চান। এই জন্যেই আমাদের জীবন-যাত্রার জন্য তিনি দশ আজ্ঞার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যদি আমরা সেগুলো পালন করি, তবে আমরা জীবনের পথ ও সুখের সন্ধান পাব। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলোকে নিষেধাজ্ঞার একটি তালিকা এবং আমাদের স্বাধীনতার অন্তরায় ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু গভীরভাবে সেগুলোকে পর্যালোচনা করলে, খ্রিস্টের শিক্ষার আলোতে আমরা দেখতে পাই যে, এগুলো আসলে অপরিহার্য এবং মূল্যবান নিয়ম, যা আমাদেরকে ঐশ-পরিকল্পনায় সুখী জীবন-যাপনের পথেই চালিত করে। কিন্তু অন্য দিকে দেখা যায়, ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও তাঁর ইচ্ছার বাইরে গিয়ে জীবন বিনির্মাণের প্রচেষ্টা কত হতাশা, বিষাদ ও ব্যর্থতা ডেকে আনে। ঈশ্বরের বিধান অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং তাঁর বন্ধুত্বকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে মানুষ যে পাপ করে, সেই পাপের কারণে তার অন্তরে বিষাদ নেমে আসে।

খ্রিস্টীয় জীবন প্রায়শঃই খুব সহজ নয়; প্রভুর ভালোবাসার প্রতি বিশ্বস্ততা নানা প্রতিকূলতাও নিয়ে আসে; মাঝে মাঝে আমাদের পতনও হয়। তবুও দয়ালু ঈশ্বর আমাদের কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাঁর কাছে ফিরে আসার পথ, তাঁর সাথে পুনর্মিলনের পথ তিনি সব সময় আমাদের জন্য খোলা রাখেন। এভাবেই আমরা তাঁর ভালোবাসার আনন্দ অভিজ্ঞতা করি, যে ভালোবাসা আমাদেরকে ক্ষমা করে, আমাদের ফিরে আসাকে স্বাগত জানায়।

প্রিয় যুবক-যুবতীগণ, ঘন ঘন অনুতাপ-পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের আশ্রয় গ্রহণ কর তোমরা! এটি হচ্ছে আনন্দকে পুনরাবিষ্কার করার সাক্রামেন্ত। তোমাদের পাপময়তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমা যাচ্না করার আলো তোমরা চেয়ে নাও পবিত্র আত্মার কাছ থেকে। নিষ্ঠা ও ভরসা নিয়ে নিয়মিত এই সাক্রামেন্তকে উদ্যাপন ক'রে যাও। প্রভু সর্বদাই তাঁর বাহু উন্মুক্ত ক'রে ধরবেন তোমার দিকে। তিনি তোমাকে পরিশুদ্ধ ক'রে তুলবেন, তাঁর আনন্দেই তোমার স্থান ক'রে দেবেনঃ যখন একজনও পাপী মানুষ মন ফেরায়, তখন স্বর্গে অনেক আনন্দ হয় (দ্রষ্টব্যঃ লূক ১৫ঃ৭)।

৬. পরীক্ষা-কষ্টের সময় আনন্দঃ

পরিশেষে, আমাদের কিন্তু মনে হ'তে পারে, আসলেই কি জীবনের পরীক্ষা-কষ্টের মধ্যে আনন্দময় জীবন-যাপন সম্ভব, বিশেষ ক'রে যখন সেই কষ্টগুলো নির্মম ও রহস্যময়? আমাদের মনে হ'তে পারে, প্রভুকে অনুসরণ ক'রে এবং তাঁতে নির্ভর ক'রে আমরা সব সময় সুখ পেতে পারি?

তোমাদের মত কিছু যুবক-যুবতীর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি, যারা খ্রিস্টের মধ্যেই জীবনের আলো খুঁজে পেয়েছিলেন; আমরাও তেমন ক'রে কঠিন অবস্থায় পেতে পারি শক্তি আর প্রত্যাশা। ধন্য পিয়ের জর্জো ফ্রাস্সাতি (১৯০১-১৯২৫) তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে এমন অনেক পরীক্ষা-প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন; একটি প্রেমের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল, যা ছিল গভীর বেদনার। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করার সময়ই তিনি তাঁর বোনকে লিখেছিলেনঃ "তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর আমি সুখী কি-না, তাহ'লে আমি বলব, কী ক'রে আমি সুখী না হয়ে থাকতে পারি? যে পর্যন্ত বিশ্বাস আমাকে শক্তি যোগায়, আমি ততক্ষণ সুখী

থাকব। একজন কাথলিক অন্য আর কিছুতে সুখ পেতে পারে না.....যে গন্তব্যের জন্য আমরা সৃষ্ট হয়েছি, তাতে কাঁটা বিছানো রাস্তা আছে ঠিকই, কিন্তু এটি তো বিষাদের পথ নয়। এটি আনন্দের, এমন কি সেখানে কষ্ট থাকলেও"(তাঁর বোন লুসিয়ানার কাছে লেখা চিঠি, তুরীন, ১৪ এপ্রিল ১৯২৫)। যখন ধন্য দ্বিতীয় জন পল ধন্য পিয়ের জর্জোকে যুবক-যুবতীদের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেন, তখন তাঁকে তিনি এ ভাবে বর্ণনা দেনঃ "তিনি ছিলেন ব্যাপ্তিশীল আনন্দের একজন যুব-ব্যক্তি, যে আনন্দ তাঁর জীবনের অনেক কষ্টকে জয় করেছিল" (যুবদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ, তুরীন, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০)।

সময়ের বিবেচনায় আমাদের যুগের মানুষ ছিলেন কিয়ারা বাদানো (১৯৭১-১৯৯০), যাঁকে সম্প্রতি ধন্য শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে। ব্যথা-যন্ত্রণাকে কিভাবে ভালোবাসার দ্বারা বদলে দেয়া যায় এবং আনন্দ-রসে অতীন্দ্রিয়ভাবে সিক্ত হওয়া যায়, তার অভিজ্ঞতা করেছিলেন এই যুবতী নারী। আঠার বৎসর বয়সে তিনি যখন ক্যান্সারে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন তিনি পবিত্র আত্মার কাছে অনুনয় ক'রে যাচ্ছিলেন সেই সমস্ত যুবক-যুবতীদের জন্য, যারা তাঁর সঙ্গে একই আন্দোলনে জড়িত ছিল। নিজের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করার সাথে সাথে তিনি ঈশ্বরকে অনুরোধ করতেন যেন তিনি তাঁর আত্মা দিয়ে সেই সকল যুবক-যুবতীকে আলোকিত করনে, যেন তিনি তাদেরকে প্রজ্ঞা ও আলো দান করেন। "সেটি সত্যিই ঐশ-উপস্থিতিতে ভরপুর সময় ছিল। আমি শারীরিকভাবে যন্ত্রণাভোগ করছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা গান গেয়ে যাচ্ছিল" (কিয়ারা লুবিক-এর কাছে চিঠি, সাস্সেল্লো, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯)। তাঁর মনের এই শান্তি ও আনন্দের মূলে ছিল প্রভুতে পূর্ণ ভরসা এবং তাঁর এই অসুস্থতাকে ঈশ্বরের রহস্যময় ইচ্ছার প্রকাশ ব'লে গ্রহণ করতে পারা, যে ইচ্ছা তাঁর নিজের এবং অন্যদের মঙ্গলের জন্য। কিয়ারা প্রায়ই বলতেনঃ "যীশু, তোমার ইচ্ছা যদি এটিই হয়, তখন আমার ইচ্ছাও এটি।"

অনেক অনেক উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র দু'টো আমরা দেখলাম। এই জীবন-সাক্ষ্য আমাদের বলে যে, প্রকৃত খ্রিস্টানগণ কখনও হতাশ বা বিমর্ষ হ'তে পারে না, এমন কি কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েও না। এগুলো আমাদেরকে আরও বলে যে, জীবন-বাস্তবতা থেকে দূরে গিয়ে নয়, বরং স্বর্গীয় শক্তির সাহায্যে প্রতিদিনের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা ক'রেই খ্রিস্টীয় আনন্দের সন্ধান পেতে হয়। আমরা জানি যে ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত খ্রিস্ট এইখানে, আমাদের সাথেই আছেন; তিনি সর্বদা বিশ্বস্ত বন্ধু হয়েই আছেন। যখন আমরা তাঁর যন্ত্রণার সহভাগী হই, আমরা তাঁর গৌরবের সহভাগীও হই। তাঁর মধ্যে এবং সঙ্গে আমাদের কষ্ট ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়। আর সেখানেই আমরা আনন্দের সন্ধান পাই (দ্রষ্টব্য: কলসীয় ১ঃ২৪)

৭. আনন্দের সাক্ষ্য বহনঃ

সুপ্রিয় বন্ধুগণ, পরিশেষে, আনন্দ-বার্তার প্রচারক হওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। অন্যেরা সুখী না হ'লে আমরাও সুখী হ'তে পারি না। আনন্দকে ভাগ ক'রে নিতে হবে। স্বয়ং যীশুকেই যে তুমি অমূল্য সম্পদ হিসেবে পেয়েছ, সে আনন্দের কথা তুমি অন্যান্য যুবক-যুবতীকে গিয়ে বল। বিশ্বাসের আনন্দকে আমরা নিজেদের মধ্যে আটকে রাখতে পারি না। আমরা যদি এই আনন্দকে ধরে রাখতে চাই, তবে তা বিলিয়ে দিতে হবে। সাধু যোহন বলেনঃ "আমরা নিজেরা যা দেখেছি আর শুনেছি, তা তোমাদেরও জানাচ্ছি, যাতে আমাদের সঙ্গে তোমরাও সেই মিলন-বন্ধনে মিলিত হ'তে পার। আমাদের সকলেরই আনন্দ যাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, সেই জন্যেই এইসব কথা লিখলাম" (১ যোহন ১ঃ৩-৪)।

খ্রিস্টধর্মকে অনেক সময়ই আমাদের স্বাধীনতা খর্বকারী এবং সুখ ও আনন্দ লাভের ইচ্ছার পরিপন্থী জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু এ অভিযোগ সত্যের ধারে-কাছেও না। খ্রিস্টান নর-নারীরাই প্রকৃত পক্ষে সুখী, কারণ তারা জানে যে তারা একা নয়। তারা জানে যে, ঈশ্বর সর্বদাই তাদের হাত ধরে রেখেছেন। যুব খ্রিস্ট-অনুসারীগণ, তোমাদেরকেই দায়িত্ব নিয়ে জগৎকে দেখাতে হবে, বিশ্বাস যে সুখ ও আনন্দ আনে, তা খাঁটি, পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী। যদিও বা কখনোও খ্রিস্টানদের জীবনযাত্রায় নিস্তেজ ভাব এবং একঘেঁয়েমি দেখা যায়, তোমাদেরই প্রথমে এগিয়ে এসে বিশ্বাসের সুখময় ও আনন্দময় দিকটি দেখাতে হবে। মঙ্গলসমাচার হচ্ছে "শুভ সংবাদ"–অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, আর আমরা প্রত্যেকেই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। জগৎকে দেখিয়ে দাও যে এটি সত্য!

তোমরা নব-মঙ্গলবাণী ঘোষণার উদমী সাক্ষী হয়ে উঠ! তোমরা তাদের কাছে যাও, যারা কষ্টে আছে, যারা আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে সেই আনন্দ দাও, যে আনন্দ যীশু দিতে চান। এই আনন্দ বহন ক'রে নিয়ে যাও তোমাদের পরিবারে, স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, তোমাদের কর্মক্ষেত্রে, তোমাদের বন্ধুদের কাছে, তোমরা যেখানে বাস কর, সেখানেই। তোমরা দেখবে কেমন ক'রে এই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে। তোমার নিজের পরিত্রাণের আনন্দ এবং অন্য মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কাজ করতে দেখার আনন্দে তোমার আনন্দ শতগুণ হয়ে উঠবে। আর জীবনের শেষ দিনে যখন তুমি প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তুমি তাঁকে বলতে শুনবেঃ "বেশ, বেশ! তুমি সত্যিই একজন সৎ বিশ্বস্ত কর্মচারী....এসো, তোমার মনিবের আনন্দের ভাগ তুমি নাও" (মথি ২৫ঃ২১)।

তোমাদের এই যাত্রায় ধন্যা কুমারী মারীয়া তোমাদের সঙ্গে থাকুন। তিনি নিজের জীবনের মধ্যে প্রভুকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন, প্রসংশাগীত ও আনন্দ-সংগীতে তিনি তা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর জয়গানে বলা হয়েছেঃ "আমার অন্তর গেয়ে উঠে প্রভুর জয়গান; আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত" (লূক ১ঃ৪৬-২৭)। মারীয়া বিনম্র ও পরিপূর্ণ সেবায় নিজেকে ঈশ্বরের ভালোবাসায় সঁপে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপে ঈশ্বরের ভালোবাসায় সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁকে "আমাদের আনন্দের কারণ" ব'লে সম্বোধন করা হয়। তিনি তোমাদেরকে সেই আনন্দের দিকে নিয়ে চলুন, যে আনন্দ কেউ কখনও তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না!

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট
ভাতিকান হ'তে, ১৫ মার্চ ২০১২

ভাষান্তরঃ ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ